আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বনু মুসত্বালাক্ব যুদ্ধ বা গাযওয়ায়ে মুরাইসী’ (৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরী) (غَزْوَةُ بَنِيْ الْمُصْطَلِقِ أَوْ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيْعِ (في شعبان سنة ٥ أو ٦ هـ))

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

বনু মুসত্বালাক্ব যুদ্ধের পূর্বে মুনাফিক্বদের রীতিনীতি

ইতোপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় সাধারণভাবে মুসলিমগণের এবং বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমনের ব্যাপারটি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, আউস এবং খাযরাজ এ দু’ গোত্রের নেতৃত্বের পদে তাঁকে বরণ করে নেয়ার জন্য যখন মুকুট তৈরি হচ্ছিল এমন এক ক্রান্তি লগ্নে তখন মদীনায় ইসলামের আলোক পৌঁছায় জনগণের মনোযোগ আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হল। এ কারণে এ ধারণাটি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ই তাকে তার এ মান-সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি তার এ বিদ্বেষমূলক মনোভাব এবং মনোকষ্ট হিজরতের প্রথম অবস্থাতেই সূচিত হয় এবং বেশ কিছুকাল যাবৎ তা অব্যাহত থাকে। কারণ, তখনো সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার একটি ঘটনা থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। সা‘দ বিন উবাদার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখার জন্য একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় পথ চলছিলেন, এমনি সময়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাইসহ কতগুলো লোক পথের ধারে আলাপ আলোচনায় রত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পথ চলতে দেখে সে তার নাকে কাপড় চাপা দিয়ে বলল, ‘আমাদের উপর ধূলোবালি উড়িয়ো না।’

অতঃপর রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন উপস্থিত লোকজনদের নিকট কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করলেন তখন সে বলল, ‘আপনি আপন ঘরে বসেই এ সব করুন। এ সবের মধ্যে আমাদের জড়াবেন না।’[1]

কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলিমগণের অসামান্য সাফল্য প্রত্যক্ষ করার পর যখন ব্যাপারটি তার নিকট পরিস্কার হয়ে গেল যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করা খুবই বিপদজনক হবে তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এবং মুসলিমগণের শত্রুই রয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল তার একটি বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। গোপনে গোপনে সে ইসলামী সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ইসলামের দাওয়াতী ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। শুধু তাই নয়, ইসলামের শত্রুদের সঙ্গেও সে ঘনিষ্ট সহযোগিতা ও আঁতাত গড়ে তুলতে থাকে। এক্ষেত্রে বনু ক্বায়নুক্বার ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনু ক্বায়নুক্বার ব্যাপারে সে অত্যন্ত বিবেকহীনতার পরিচয় দিয়েছিল (ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। একইভাবে সে উহুদের যুদ্ধেও শঠতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাদের কাতারে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ব্যাকুলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল (এ বিষয়টিও পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

এ মুনাফিক্ব (কপট) ব্যক্তিটি নানা ছল-চাতুরী-প্রতারণা ও ধূর্ততার মাধ্যমে রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতেই থাকত। প্রত্যেক জুমআর দিনে খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে তিনি যখন আগমন করতেন তখন সে

অযাচিতভাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে বলত, ‘হে লোক সকল! তোমাদের মাঝে এ ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে মান সম্মান ও ইজ্জত দান করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তোমরা তাঁর হাতকে শক্তিশালী করবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে।’ -এ সকল অযাচিত ও অর্থহীন কথাবার্তার পর সে বসে পড়ত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পর উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা দান করতেন।

এভাবে তার ঔদ্ধত্য, অন্যায় আচরণ এবং নির্লজ্জতা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল উহুদ যুদ্ধের পর যখন জুমু‘আর দিন উপস্থিত হল। কেননা, এ যুদ্ধের সময় অনন্ত শঠতা, কপটতা এবং প্রতারণামূলক ভূমিকা পালনের পরেও খুৎবার পূর্বে সে দাঁড়িয়ে সে সব কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকল যা ইতোপূর্বে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছিল। কিন্তু এবার উপস্থিত মুসলিম জনতা নির্বিবাদে তার এ সব কথা মেনে নিতে পারল না। চতুর্দিক থেকে তারা তার কাপড় টেনে ধরে বলল, ‘ওহে আল্লাহর শত্রু, বসে পড়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুমি যে ভূমিকা পালন করেছ তারপর তুমি এর যোগ্য নও।’

বিক্ষুব্ধ লোকজনদের প্রতিবাদে সে বকবক করতে করতে মসজিদ পরিত্যাগ করল। মসজিদ পরিত্যাগকালে তার কণ্ঠ-নিঃসৃত এ প্রলাপ বাক্যগুলো সকলের শ্রুতিগোচর হল, ‘আমি যেন এখানে কোন অপরাধী এসেছি। আমিতো তাঁরই সমর্থনে বলার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম।’

ভাগ্যক্রমে দরজায় একজন আনসারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, ‘তোমার ধ্বংস হোক ! ফিরে চল! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে দিবেন। সে বলল, ‘আল্লাহর শপথ! আমি চাই না যে, তিনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’

এছাড়াও, ইবনু উবাই বনু নাযীর গোত্রের সঙ্গেও গোপনে আঁতাতের মাধ্যমে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল।

আল-কুরআনের ভাষায় তাদেরকে বলা হয়েছিল :

(لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ) [الحشر: 11]

‘তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব, আর তোমাদের ব্যাপারে আমরা কক্ষনো কারো কথা মেনে নেব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।’ [আল-হাশর (৫৯) : ১১]

অনুরূপভাবে খন্দকের যুদ্ধেও সে মুসলিমগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, চাঞ্চল্য ও ভীতি সঞ্চারের জন্য নানা কূট কৌশল প্রয়োগ করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা সূরাহ আহযাবের নিম্ন বর্ণিত আয়াত সমূহে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন :

(وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا غُرُوْراً ـ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيْدُوْنَ إِلَّا فِرَاراً ـ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوْا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا إِلَّا يَسِيْراً ـ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوْا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُوْلاً ـ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلاً ـ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوْءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيْراً ـ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيْلاً ـ

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْراً ـ يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِيْ الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَا قَاتَلُوْا إِلَّا قَلِيْلاًـ) [الأحزاب: 20-12]

‘আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিক্করা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল- আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়া‘দা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- হে ইয়াসরিববাসী! তোমরা (শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না, কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল এই বলে নাবীর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই তাদের ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি শত্রুপক্ষ (মাদীনাহ নগরীর) চারদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করতো, অতঃপর তাদেরকে কুফুরীর আহবান করা হত, তবে তারা তাই করে বসত। তাতে তারা মোটেও বিলম্ব করত না। অথচ তারা ইতোপূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়া‘দা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। বল, পলায়নে তোমাদের কোনই লাভ হবে না, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তাহলে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। বল, তোমাদেরকে আল্লাহ (’র শাস্তি) হতে কে রক্ষে করবে তিনি যদি তোমাদের অকল্যাণ করতে চান অথবা তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে চান? তারা আল্লাহকে ছাড়া তাদের জন্য না পাবে কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদেরকে নিশ্চিতই জানেন কারা বাধা সৃষ্টিকারী আর কারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে- আমাদের কাছে এসো। যুদ্ধ তারা সামান্যই করে তোমাদের প্রতি কৃপণতার বশবর্তী হয়ে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে। অতঃপর বিপদ যখন কেটে যায় তখন ধনের লালসায় তারা তোমাদেরকে তীক্ষ্ম বাক্য-বাণে বিদ্ধ করে। এরা ঈমান আনেনি। এজন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিস্ফল করে দিয়েছেন, আর তা আল্লাহর জন্য সহজ। তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। সম্মিলিত বাহিনী যদি আবার এসে যায়, তাহলে তারা কামনা করবে যে, যদি মরুচারীদের মধ্যে থেকে তারা তোমাদের সংবাদ নিতে পারত! তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ সামান্যই করত।’ [আল-আহযাব (৩৩) : ১২-২০]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে অবস্থা বিশেষে মুনাফিক্কদের চিন্তা ও ভাবধারা, কার্যকলাপ, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা এবং সুযোগ সন্ধান ও সুবিধা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে।

এত সব কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইহুদী, মুনাফিক্ক, মুশরিকগণ এক কথায় ইসলামের শত্রুগণ এটা ভালভাবেই ওয়াকেফহাল ছিল যে, মুসলিমগণের বিজয়ের কারণ প্রাকৃতিক প্রাধান্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী কিংবা বাহিনীর লোকজনদের সংখ্যাধিক্য নয় বরং এর প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহর দাসত্বকরণ এবং একনিষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন যার দ্বারা পূর্ণ ইসলামী সমাজ সংগঠন সম্ভব হয়েছিল এবং এর ফলে দ্বীন ইসলামের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন পরিতৃপ্ত ও নিবেদিত। তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবানও মনে করতেন একমাত্র দ্বীনের কারণে। ইসলামের শত্রুগণ এটাও ভালভাবেই জানতে যে মুসলিমগণের অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সত্তা মুবারক যা মুসলিমগণের চরিত্র সম্পদ ও চরিত্র মাধূর্যের অলৌকিকত্বের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে ছিল সব চাইতে বড় আদর্শ।

অধিকন্তু, ইসলাম ও মুসলিমগণের শত্রুরা চার পাঁচ বছর যাবৎ শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সাধ্যমতো

সব কিছু করেও যখন তারা এটা উপলব্ধি করল যে, এ দ্বীন এবং অনুসারীগণকে অস্ত্রের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়, তখন তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকল। তাদের এ বিকল্প কৌশল হিসেবে তারা মুসলিমগণের শক্তি এবং শৌর্যবীর্যের প্রধান, চরিত্র-সম্পদের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের হীন চক্রান্তের প্রথম লক্ষ্যস্থল নির্বাচন করল আল্লাহর নাবী (ﷺ)-কে। কারণ, মুনাফিক্বরা মুসলিমগণের শ্রেণীতে ছিল পঞ্চম বাহিনী। মদীনায় বসবাস করার ফলে মুসলিমগণের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ তাদের ছিল। এ কারণে কূট কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে সহজভাবে প্রলুব্ধ করার সুযোগও তাদের ছিল। তাদের এ জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা শুরু করল ব্যাপক অপপ্রচার। মুনাফিক্বগণ তাদের এ প্রচার ভিযানের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিল অথবা তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আর এর নেতৃত্বের ভার স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন উবাই বহন করছিল।

যখন যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ) যায়নাবকে তালাক প্রদান করেন এবং নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন মুনাফিক্বগণ রাসূলুল্লাহর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করা ও অপ্রপ্রচারের একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কারণ, তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথায় পোষ্য পুত্রকে প্রকৃত সন্তানের মর্যাদা ও স্থান দেয়া হতো এবং পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকে প্রকৃত পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় অবৈধ গণ্য করা হত। এ কারণে, নাবী কারীম (ﷺ) যখন যায়নাবকে বিবাহ করলেন তখন তারা নাবীর (ﷺ) বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করে দিল।

যায়নাব (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিবাহ করার ব্যাপারে মুনাফিক্বগণ তাদের অপ-প্রচারের আরও যে সূত্রটি আবিষ্কার ও ব্যবহার করল তা হচ্ছে-

১. যায়নাব (রাঃ) তাঁর পঞ্চম পত্নী। তাদের প্রশ্ন ছিল, কুরআনুল কারীমে যেখানে চারটির অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয় নি। সেক্ষেত্রে এ বিবাহ কিভাবে বৈধ হতে পারে?

২. তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, যায়নাব হচ্ছে নাবী কারীম (ﷺ)-এর ছেলের (পোষ্য পুত্রের স্ত্রী)। তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এ বিবাহ ছিল অবৈধ এবং কঠিন পাপের কাজ।

এ বিবাহকে কেন্দ্র করে তারা নানা অলীক ও ভিত্তিহীন কাহিনী রচনা করে এবং জোর গুজব ছড়াতে থাকে। লোকে এমনটিও বলতে থাকে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) জয়নবকে দেখা মাত্র তাঁর সৌন্দর্য্যে এমনভাবে আকৃষ্ট হল যে, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মন দেয়া নেয়া হয়ে গেল। যায়দ এ খবর জানতে পারল তখন সে যায়নাবকে তালাক দিল।

মুনাফিক্বগণ এত জোরালোভাবে এ ঘৃণ্য কল্প কাহিনী প্রচার করতে থাকল যে, এর জের হাদীস এবং তফসীর কিতাবে এখন পর্যন্ত চলে আসছে। ঐ সময় এ সমস্ত অপ-প্রচার দুর্বল চিত্ত এবং সরলমন মুসলিমগণের অন্তরকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন। যার মধ্যে সন্দেহ ব্যাধিতে আক্রান্ত অন্তরসমূহের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। প্রাসঙ্গিক আয়াতে কারীমা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ প্রচারের ব্যাপকতা কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সূরাহ আহযাবের সূচনাই হয়েছিল এ আয়াতে কারীমা দ্বারা :

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا) [الأحزاب : 1]

'হে নাবী! আল্লাহকে ভয় কর, আর কাফির ও মুনাফিক্বদের আনুগত্য কর না, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, মহাপ্রজ্ঞাময়।' [আল-আহযাব : ১]

এ আয়াতে কারীমা ছিল মুনাফিক্বদের কার্যকলাপ ও কর্মকান্ডের প্রতি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং তাদের চক্রান্তের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর স্বভাবজাত উদারতা এবং ধৈর্যের সঙ্গে মুনাফিক্বদের এ সকল অন্যায় আচরণ সহ্য করে আসছিলেন। সাধারণ মুসলিমগণও তাদের প্রতিহিংসা পরায়নতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে চলছিলেন। কারণ, তাঁদের নিকট বহুবার এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, মুনাফিক্বগণ আল্লাহর তরফ থেকেই মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে আসছে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল মাজীদে ইরশাদ করেছেন:

(أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوْبُوْنَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ) [التوبة: 126]

‘তারা কি দেখে না যে, প্রতি বছরই তাদেরকে একবার বা দু’বার পরীক্ষায় ফেলা হয় (তাদের ঈমান আনার দাবী সত্য না মিথ্যা তা দেখার জন্য) তারপরেও তারা তাওবাও করে না, আর শিক্ষাও গ্রহণ করে না।’ [আত-তাওবাহ (৯) : ১২৬]

ফুটনোট

[1] ইবনু হিশম, ১ম খন্ড, ৫৮৪ ও ৫৮৭ পৃ: সহীহুল বুখারী ৯২৪ পৃ: সহীহুল মুসলিম ২য় খন্ড ১০৯ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6300

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন